একক ২ □ মাইকেল মধুসূদন দত্তের ‘বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ’

পর্যায় ১ একক ২

২.০ প্রস্তাবনা

২.১ বিষয়বস্তু

২.২ প্রহসনের ভাষা

২.৩ চরিত্র বিশ্লেষণ

২.৪ অন্যান্য চরিত্র

২.৫ প্রহসন ঃ তুলনা এবং প্রতিতুলনা

২.৬ বিস্তৃত প্রশ্ন

২.৭ অবিস্তৃত প্রশ্ন

২.৮ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

২.০ প্রস্তাবনা

‘অলীক কুনাট্য-রঙ্গে মজে লোকে রাঢ়ে বঙ্গে
নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়।’

১৮৫৮ সালে বেলগাছিয়া নাট্যশালায় অভিনীত রামনারায়ণ তর্করত্নের ‘কুলীনকুলসর্বস্ব’ নাটককে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে মধুসূদন তাঁর ‘শর্মিষ্ঠা’ নাটকের প্রস্তাবনায় একথা জানিয়েছিলেন। ফলে মধুসূদনের আবির্ভাবে বাংলা নাট্য-সাহিত্য মুক্তির পথ খুঁজে পেল। তিনিই প্রথম সংস্কৃত ধারা ও ইংরেজি ধারার পার্থক্যটি গভীরভাবে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন এবং তিনি তাঁর প্রথম দুটি নাটকে উভয় রীতিকেই অনুসরণ করেছিলেন। মহাভারতের শর্মিষ্ঠা-দেবযানী-যযাতির কাহিনি অবলম্বনে মধুসূদন পৌরাণিক নাটক ‘শর্মিষ্ঠা’ রচনা করলেন ১৮৫৯-এ। তাঁর দ্বিতীয় নাটক ‘পদ্মাবতী’ (১৮৬০) গ্রীক পুরাণের কাহিনি আশ্রয়ে রচিত হল। এরপর তাঁর শেষ পূর্ণাঙ্গ নাটক ও বাংলা সাহিত্যে প্রথম ট্রাজেডি ‘কৃষ্ণকুমারী’ (১৮৬০) রচিত হয়। ‘কৃষ্ণকুমারী’ নাট্যকার মধুসূদন প্রতিভার সর্বশ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞান। কৃষ্ণকুমারীর পর মধুসূদন ‘মায়াকানন’ রচনা করেন। অতঃপর মধুসূদন ইংরেজি কমেডির আদর্শে ‘একেই কি বলে সভ্যতা’ এবং ‘বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ’ নামে দুটি প্রহসন রচনা করেন। এই প্রথম বাংলা নাটক ইংরেজি আদর্শ আয়ত্ত করল। এ যুগের প্রায় অসংখ্য প্রহসনের মধ্যে এ দুটির অনন্যতা শুধু রচনাভঙ্গীর জন্যই নয়, সমাজ-চেতনার বিশিষ্টতা এবং ব্যাপকতার কথাও স্মরণীয়। দুটি প্রসনই নক্‌শাধর্মী বিচ্ছিন্ন নাট্যচিত্র না হয়ে পূর্ণাঙ্গ কাহিনি ভিত্তিক রচনা হয়ে উঠেছে। মধুসূদনের এই নাট্যরীতি পরবর্তীকালে নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রকে, নাটক রচনায় প্রভাবিত করেছিল।

"In the great European Drama you have the stern realities of life, lofty passion, and heroism of sentiment; with us it is all softness, all romance. We forget the world of reality and dream of fairy land...... Ours are dramatic poem......"

—মাইকেল মধুসূদন দত্ত নিজেই একথা চিঠিতে জানিয়েছিলেন। তিনি নিজে কিন্তু ১৮৫৯-এ 'শর্মিষ্ঠা' নাটক লিখে নাট্যরচনার সূচনা করার সময় 'all softness, all romance'—কেই নাটকের মূল রস হিসেবে ব্যবহার করেছেন। 'Stern realities'-এ তাঁর প্রথম পদার্পণ ১৮৬০-এ প্রথমে 'একেই কি বলে সভ্যতা' এবং পরে 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনের মধ্যে দিয়ে। 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' অবশ্য বাংলার প্রথম প্রহসন নয়। সে কৃতিত্ব মধুসূদনের পূর্বসূরী কালীপ্রসন্ন সিংহের। ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'বাবু' প্রহসনটি বাংলা সাহিত্যের প্রথম প্রহসন। সেখানেও সমাজ-সমস্যাকে তুলে ধরা হয়েছে। তারপরের বছর ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে রাম নারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটকেও সমাজের বিক্ষত-বিকৃত চেহারা উঠে এল।

'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনের বিশিষ্টতা অন্য জায়গায়। বাংলা নাটক-প্রহসনের পটভূমি গ্রাম এবং সেখানে দুশ্চরিত্র সামন্তপ্রভুর শোষণের কথা এত নির্দিষ্ট করে এই প্রথম উঠে এল বাংলা নাটক প্রহসনে।

২.১ বিষয়বস্তু

'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনের বিষয়বস্তু আসলে অবক্ষয়। সামন্তপ্রভুর নৈতিক অবক্ষয়। কুলীন পুরুষের বহুবিবাহ নিয়ে আন্দোলনের ফলে তার আইনী প্রতিকার হয়েছিল। কিন্তু শুধুই যে কুলীনের বিবাহ— এবং বিবাহ এমনটাতো নয়। সমাজের ক্ষতটা ছিল আরও বিপজ্জনক-সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় যাদের হাতেই জমিজমা-টাকাপয়সা ছিল তাদের মধ্যে অনেকেই এই ব্যবস্থার সুযোগ নিয়েছে। বিয়ের নামে যে সামাজিক বঞ্চনার শিকার মেয়েদের হতে হত সেখানে তো তবু স্বীকৃতি এবং সামাজিকতার একটা ব্যাপার ছিল, কিন্তু যেসব সালিকের ঘাড়ে রোঁ গজাত, তাদের বৈবাহিক সম্পর্কের বাইরে যাওয়ার ঘটনাও কম ছিল না। মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁর 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ প্রহসনে তেমনই এক চরিত্র এবং ঘটনাকে উপস্থাপিত করেছেন। ভক্তপ্রসাদবাবু, জমিদার এবং বাচস্পতি, হানিফ গাজি ইত্যাদি প্রজাদের অত্যন্ত কঠোর হাতে দমন করে থাকেন। অর্থনৈতিক শোষণেও তিনি সিদ্ধহস্ত। তাঁর ছেলে অম্বিকা কলকাতায় থেকে পড়াশোনা করে। গদাধর, পুঁটি-এরা তার সমস্ত অপকর্মের সাক্ষী ও সহায়ক। হানিফ গাজি একজন কৃষক। বৃষ্টি না হওয়ার ফলে ক্ষেতে ফসল ফলে না। ভক্তপ্রসাদবাবুর কাছে এগারো সিকে কর সে দিতে পারে না। তাঁর কাছে তিন সিকে ছাড়া আর কোন পয়সা ছিল না। দরিদ্র কৃষকের কান্নায় অত্যাচারী সামন্তপ্রভুর মন কোনওদিনও গলেনি। এক্ষেত্রেও তেমনটাই ঘটে। ভক্তপ্রসাদ গদাধরকে হুকুম দেন; "এ পাজি বেটাকে ধরে নে যেয়ে জমাদারের জিম্বে করে দে আয় তো।" নিরুপায় হানিফ ভক্তপ্রসাদের কাছের লোক গদাধরকে অনুনয় বিনয় করে এবং হানিফ গাজি রেহাইও পেয়ে যায়। ঘটনাটা এই রকম ঃ

পর্যায় এক

ভক্ত। এ পাজি বেটাকে ধরে নে জমাদারের জিম্বে করে দে আয় তো।

গদা। যে আজ্ঞে। (হানিফের প্রতি) চল্ রে।

হানিফ।	কত্তাবাবু, আমি বড় কাঙ্গাল রাইওৎ। আপনার খায়ে পরেই মানুষ হইছি, এখনে আর যাবো কনে?
ভক্ত।	নে যা না—আবার দাঁড়াস কেন?
গদা।	চল্ না।

মাঝখানের প্রহসন

হানিফ। ...... (গদার প্রতি জনান্তিকে) তুই ভাই আমার হয়ে দু এট্টা কথা বল্ না কেন?

গদা। আচ্ছা। তবে তুই একটু সরে দাঁড়া।

পর্যায় দুই

ভক্ত।	ভাল। আমি যদি আজ তিন সিকে নিয়ে তোকে ছেড়ে দিন, তবে দুই বাদ্‌বাকি টাকা কবে দিবি বল্ দেখি?
হানিফ।	কত্তামশায়, আল্লাতালা চায় তো মাস দ্যাড়েকের বিচেই দিতি পারবো।
ভক্ত।	আচ্ছা, তবে পয়সাগুলো দেওয়ান্‌জীকে দেগে।

অর্থাৎ প্রথম পর্যায়ে দরিদ্র হানিফের শত অনুনয় বিনয়েও যে সামন্তপ্রভুর বিন্দুমাত্র করুণা হয়নি, বরং তার কথা শুনে বিরক্ত হয়ে গদাধরকে আদেশ দিয়েছিল তাকে নিয়ে যাবার, দ্বিতীয় পর্যায়ে সে যে কোন শর্তেই টাকা পেতে রাজি। হানিফ দেড়মাস সময় চাইলেও অনায়াসে মেনে নেয়। দুটি পর্যায়ে যে ভক্তপ্রসাদবাবুকে দেখা যায়, তারা যেন দুটি পৃথক মানুষ। আসলে এই দুই পর্যায়ের মাঝখানে যে প্রহসনটুকু আছে, সেটিই পরবর্তী নাট্যঘটনা। হানিফ সাহায্য চেয়েছিল গদাধরের কাছে। গদাধর ভক্তপ্রসাদের দুর্বলতার কথা বিলক্ষণ জানত। সে টোপ হিসেবে ব্যবহার করেছিল হানিফের নতুন নিকে করা বিবি ফতেমাকে। ভক্তপ্রসাদ ফতেমার সৌন্দর্যের বর্ণনা শুনে একটা বিকৃত আদিম কামনায় অধীর হয়ে হানিফের কর সম্পর্কিত সত্তদায় উদার হয়ে উঠেছিলেন। গদাধর আর তার পিসি পুঁটি ফতেমার সঙ্গে কত্তাবাবুর দেখা করিয়ে দেবার দায়িত্ব পেয়েছিল। ফতেমার কাছে পুঁটি সে প্রস্তাব রাখে। ফতেমাকে একুশ টাকা অগ্রিম দিয়ে, নিজের জন্য চার টাকা দস্তুরি রেখে পুঁটি সব ব্যবস্থা পাকা করে দিয়ে যায়। 'সাঁজের বেলা' 'আঁব বাগানে' যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে পুঁটি চলে যায়। ফতেমা অকপটে সব কথা হানিফকে জানায়। হানিফ প্রাথমিক আক্রোশ কাটিয়ে উঠতে না উঠতে তার দেখা হয়ে যায় বাচস্পতির সঙ্গে। বাচস্পতি ব্রাহ্মণ হলেও হানিফের সঙ্গে তার শ্রেণিগত অবস্থানের বিশেষ তারতম্য নেই। তার মাতৃবিয়োগ হয়েছিল। জমিদার ভক্তপ্রসাদ তার সব সম্পত্তি আত্মসাৎ করেছে। নিঃস্ব বাচস্পতি মায়ের শ্রাদ্ধের জন্য সাহায্য চাইতে গেলে জমিদার তাকে মাত্র পাঁচ টাকা দিয়ে বিদায় করে। হানিফের কাছে বাচস্পতি যায় অন্য এক সাহায্যের আশায়। একটা তেঁতুল গাছ কাটার জন্য হানিফের সাহায্য চায় বাচস্পতি। বাচস্পতির কাছে হানিফ বলে ভক্তপ্রসাদের সমস্ত কীর্তির কথা। বাচস্পতির পরিকল্পনামাফিক ভক্তপ্রসাদকে শিক্ষাদেবার ব্যবস্থা করে তারা।

ভক্তপ্রসাদ বৃদ্ধ বয়সে হানিফের তরুণী স্ত্রীকে পাওয়ার আনন্দে বেশবাস পরিপাটি করে অপেক্ষা করে বসে থাকেন সূর্য ডোবার। 'আঁব বাগানে'র পরিবর্তে পুকুর পাড়ের ভাঙা শিবের মন্দিরে মিলনের স্থান

নির্দিষ্ট হয় 'রাত চার ঘড়ীর সময়'। ফতেমা হানিফের পরিকল্পনা অনুযায়ী মিলনস্থানে উপস্থিত হয় পুঁটির সঙ্গো। হানিফ ও বাচস্পতি লুকিয়ে থাকে আগে থেকেই। প্রমাণ-সহ ধরে ফেলে ভক্তপ্রসাদকে। যদিও একটা ছোট্ট নাটকের আশ্রয় নেয় তারা। হানিফ ভূতের বেশ ধরে লাফিয়ে পড়ে ভক্তপ্রসাদের ঘাড়ে। আর ভক্তপ্রসাদের গোঙানির আওয়াজ শুনে হতভম্ব পথিকের মত উদ্ধারকর্তা হয়ে বাচস্পতি এসে দাঁড়ায়। অবশেষে বাচস্পতি নগদ পঞ্চাশ টাকা এবং হানিফ দুশো টাকা নিয়ে রফা করে। ভক্তপ্রসাদ লোক অপবাদের ভয়ে তাতেই রাজি হয়ে যায় এবং এমন কাজ আর করবেন না বলে স্বীকার করেন।

২.২ প্রহসনের ভাষা

'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনে কথোপকথনের মধ্যে ভাষা ব্যবহারে আশ্চর্য নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন মধুসূদন দত্ত। যশোরের ভূমিপুত্র হওয়ার সূত্রে সেই অঞ্চলের ভাষার সঙ্গো পরিচিত ছিলেন নাট্যকার। যদিও বেশিরভাগ সময়টাই কেটেছে তাঁর কলকাতা এবং মাদ্রাজের শিক্ষিত এবং অতি পরিশীলিত পরিবেশে। 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনে ভক্তপ্রসাদবাবু এবং আনন্দ সমাজের উচ্চবিত্ত স্তরের মানুষ। বাচস্পতি উচ্চকোটির মানুষ হলেও অর্থনীতির কাঠামোয় তার অবস্থান নিম্নস্তরে। মধুসূদন অত্যন্ত কুশলতায় প্রত্যেকের সংলাপের মধ্য দিয়ে তাদের অবস্থানগুলি চিহ্নিত করে দিয়েছেন। গদাধর, পুঁটি, রাম—এরা যদিও হানিফ-ফতেমার মতনই দরিদ্র কিন্তু এরা হিন্দু। অতএব হানিফের কথা আর গদাধরের কথার ভাষা বৈশিষ্ট্যও বদলে যায়।

হানিফের কথায় অনেক আরবি-ফার্সি শব্দের ব্যবহার আছে, ঈষৎ পরিবর্তিত বা অশুদ্ধ উচ্চারণে, যা বাচস্পতি বা গদাধরের কথায় নেই। যেমন—মজ্জি, আখেরে, ওয়াকিফ্, মেহেরবানি, হারামজাদা, এনছাফ, কাফের, নওয়ার, কসবগিরি, গস্তানী, ইজ্জত, ইয়াদ, সম্‌ঝে, থোড়া, বাৎচিত্, সালাম, তল্লাস্, টুঁড়তি টুঁড়তি, তজদি, লেকিন, ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার রয়েছে হানিফের কথায়। ফতেমার কথায়ও এই ধরনের শব্দ কিছু কিছু উঠে এসেছে। যেমন—জওয়ান খসম্, মালুম্ করা, আদ্‌মি ইত্যাদি শব্দ।

গদাধরের কথায় আঞ্চলিকতার ছাপ স্পষ্ট। গ্রাম্য কথ্য ভাষা তার সংলাপে ব্যবহার করেছেন নাট্যকার। অসংখ্য স্বগত কথন ব্যবহৃত হয়েছে এই প্রহসনে। তার মধ্যে অনেকটাই গদাধরের। তার কারণ সে আসলে দরিদ্র মানুষ হলেও জমিদারের অধীনস্থ কর্মচারী। অতএব জমিদারের বিকৃত চাহিদার যোগান দেওয়ার কাজ যেমন তাকে করতে হয়, তেমনি নিজের বিবেকের সামনাসামনি সে যখন দাঁড়ায় তখন ভক্তপ্রসাদবাবুর সমালোচনা না করে পারে না। সে কারণেই স্বগত কথনের আশ্রয় নিতে হয় তাকে।

পঞ্চানন বাচস্পতি দরিদ্র হলেও ব্রাহ্মণ হওয়ার সূত্রে তার ভাষা অনেক পরিশীলিত। আঞ্চলিকতার প্রভাব নেই। বরং সংস্কৃত ঘেঁষা কথা তার মুখে শোনা যায়। তার মা মারা গেলে ভক্তপ্রসাদের কাছে গিয়ে সে বলে, "......এত দিনের পর মা ঠাকরুণের পরলোক হয়েছে।" এবং ভক্তপ্রসাদের প্রশ্নের উত্তরে আরও জানায় "অদ্য চতুর্থ দিবস"।

আনন্দ কলকাতায় থেকে পড়াশোনা করে। ইংরেজি জানা কলকাতাবাসী এই মানুষটির মুখে তাই

আঞ্চলিকতার ছাপ তো থাকেই না। বরং থাকে ইংরেজি বিদ্যাশিক্ষার ছাপ। ভক্তপ্রসাদ-পুত্র অম্বিকা আনন্দের কথায় হিন্দু কলেজের সবচেয়ে 'ক্লেবর্ ছোকরা'।

ভক্তপ্রসাদের কথায় আঞ্চলিকতার প্রভাব স্পষ্ট হয় স্বগত কথনে আর যখন সে নিম্নবর্গ ভৃত্যদের সঙ্গে কথা বলেন। তখন 'ছুঁড়ী', 'হানফের মাগ', 'ছেনালি', ইত্যাদি কথা অনায়াসে স্থান পায় জমিদার মশাইয়ের ভাষায়। কলকাতাবাসী আনন্দর সঙ্গে কথা বলার সময় ভক্তপ্রসাদ অম্বিকার দায়িত্বশীল এবং রক্ষণশীল পিতা। অতএব নব্যশিক্ষিত বাবুদের ঠিক বিপরীত কথা বলার একটা প্রয়াস এবং নিজেকে রক্ষণশীল, ন্যায়নিষ্ঠ দেখানোর প্রয়াস ধরা পড়ে তাঁর কথায়। তখন 'তোমাদের ইংরেজি কথা' এবং 'আমাদের কানে ভাল লাগে না', 'কুকর্ম্মাচারী', 'মুসলমান বাবুর্চী', 'কুলে কলঙ্ক', 'পিতৃপিতামহের শ্রাদ্ধ' ইত্যাদি কথা ভক্তপ্রসাদের মুখে শোনা যায়। আবার ভক্তপ্রসাদ যকন হানিফের স্ত্রী ফতেমার সঙ্গে মিলিত হতে যান; তখন ভক্তপ্রসাদের সংলাপ অন্যরকম ঃ

"আমার হাতবাক্সটা আর আরসিখানা আন্ তো।

(স্বগত) দেখি, একটু আতর গায় দি। (নেড়েরা আবাল বৃদ্ধ বনিতা আতরের খোস্বু বড় পছন্দ করে। ......"

ফতেমাকে দেখার পর তাকে প্রেম নিবেদন করার সময় ভক্তপ্রসাদের ভাষা কাব্যিক ঃ

"বিধুমুখি, তোমার বদনচন্দ্র দেখে আজ আমার মনকুমুদ প্রফুল্ল হোলো!—আঃ!"

ফতেমা আর পুঁটির ধর্মীয় পার্থক্যের কারণে তাদের ভাষা যেমন কিছুটা বদলে যায়, তেমনি মেয়েলি ভাষার ব্যবহার দুজনের সংলাপের একটা সাদৃশ্যও বটে।

এভাবেই সমগ্র প্রহসনে নানা শ্রেণির মানুষের সংলাপে ভাষার পার্থক্য রয়েছে। বাংলা সাহিত্যের গোড়ার দিকের প্রহসন হওয়া সত্ত্বেও ভাষা ব্যবহারের নৈপুণ্য 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ" প্রহসনের একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। এই কৃতিত্ব নাট্যকারের প্রাপ্য। তিনি নিজের অবস্থান উত্তীর্ণ হয়ে চরিত্রগুলির কাছাকাছি এসে দাঁড়াতে পেরেছেন এবং প্রহসনটি ভাষাগত দিক থেকে সমৃদ্ধ হয়েছে।

২.৩ চরিত্র বিশ্লেষণ

ভক্তপ্রসাদ ঃ ভক্তপ্রসাদই মধুসূদের এই প্রহসনের 'বুড় সালিক'। সামন্তপ্রভু হওয়ার সূত্রে ভক্তপ্রসাদের যে পরিচয় সর্বপ্রথম উঠে আসে সেখানে সে অত্যাচারী শোষক। সারাক্ষণ তার মুখে হরি, দীনবন্ধু ইত্যাদি শোনা যায়। মালা জপতে জপতেই হানিফকে বলেন, "তোদের ফসল হৌক আর না হৌক তাতে আমার কি বয়ে গেল।" প্রত্যাশিতভাবেই দুরকম মুখোশের আড়ালে একজন লোভী, দুশ্চরিত্র মানুষ বাস করে। একটা মুখোশ সামন্তপ্রভুর আর একটা নিষ্ঠাবান বৈষ্ণবের। গদাধরের মুখে হানিফের নতুন নিকে করা 'ছুড়ী'র রূপের বর্ণনা শুনে তাই প্রাথমিক ধাক্কায় জমিদারবাবুর মালা জপার বেগ বেড়ে যায়। মুসলমানের মেয়ে-বউদের সম্পর্কে তার প্রথম প্রতিক্রিয়া তাদের 'মুখ দিয়ে যে প্যাঁজের গন্ধ ভক্‌ভক্ করে বেরোয় তা মনে হল্যে

বমি এসে'। ভক্তপ্রসাদ একটু চিন্তিতও হয়ে পড়েন পরকালের কথা ভেবে। কিন্তু নিজের পক্ষে যুক্তিখাড়া করতে তাঁর বিলম্ব হয় না। এবং পরম বৈষ্ণবের মতই সমস্ত ভালোমন্দের দায় অবশেষে ঈশ্বরের ওপর ন্যস্ত করে নিশ্চিন্ত হন "দীনবন্ধো, তুমিই যা কর। হা, স্ত্রীলোক—তাদের আবার জাত কি? তারা তো সাক্ষাৎ প্রকৃতিস্বরূপা, এমন তো আমাদের শাস্ত্রেও প্রমাণ পাওয়া যাচ্যে;—বড় সুন্দরী বটে, অ্যাঁ? ..."ভক্তপ্রসাদ নারীর বিষয়ে খরচ সম্পর্কে অকৃপণ হয়ে পড়েন। আসলে হানিফের স্ত্রী ফতেমাই নয়, যে কোন নারী সম্পর্কেই ভক্তপ্রসাদের এই দুর্বলতা। তাই ফতেমা সম্পর্কে প্রলুব্ধ হতে হতেই পীতাম্বরের মেয়ে পঞ্চীকে দেখে ভক্তপ্রসাদ একটা বিকৃত কামনায় পুড়তে থাকেন।

ভক্তপ্রসাদ বুড়ো হলেও কামনার আগুন তৃপ্ত হয় না। আসলে সমাজপতি সেজে সমাজের মাথায় বসে থেকে যারা ধর্মের জয়জয়কার করে, তাদের মধ্যেই থাকে ভক্তপ্রসাদের মত অসৎ মানুষ। সমাজপতি হওয়ার সূত্রে নিজের সমস্ত অপকর্মের ব্যাখ্যা শাস্ত্র থেকে খুঁজে নেয়। আসলে শাস্ত্রের অপব্যাখ্যায় ভক্তপ্রসাদের জুড়ি নেই। শাস্ত্রের দোহাই দিয়েই একটা বড় সময় ধরে কৌলিন্য প্রথা চলেছে। পুরুষের বহুবিবাহকে গৌরবান্বিত করা হয়েছে। শাস্ত্রের দোহাই দিয়েই বাল্যবিবাহ হয়েছে। শাস্ত্রের দোহাই দিয়েই সতীদাহ হয়েছে। ভক্তপ্রসাদ নিজের কামনা চরিতার্থ করতে গিয়ে দু'বার শাস্ত্রের দোহাই পেড়েছেন—

(ক) হানিফের স্ত্রী ফতেমার সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি হলে ভক্তপ্রসাদের পরকাল 'নষ্ট' হয়ে যাবে কিনা, এই চিন্তা প্রথমেই উদয় হয়। আসলে তো পরকালের চেয়ে ইহকালের কামনার টান ভক্তপ্রসাদের অনেক বেশি। অতএব ঃ "হাঁ, স্ত্রীলোক—তাদের আবার জাত কি? তারা তো সাক্ষাৎ প্রকৃতিস্বরূপা, এমন তো আমাদের শাস্ত্রেও প্রমাণ পাওয়া যাচ্যে, ..."

(খ) হানিফের স্ত্রী সম্পর্কে ভক্তপ্রসাদবাবুর আসক্তির একটা বড় হেতু—সে সুন্দরী। কিন্তু তার চেয়েও বেশি লোভ বা আকর্ষণ, তার যৌবনের প্রতি। মনে মনে তার শাস্ত্রের একটা কুৎসিত অপব্যাখ্যা দিয়ে বৃদ্ধ ভক্তপ্রসাদ বলেন ঃ "ছড়ী দেখ্‌তে মন্দ নয়, বয়স অল্প, আর নবযৌবনমদে একেবারে যেন ঢলে ঢলে পড়ে। শাস্ত্রে বলেছে যে, যৌবনে কুক্কুরীও ধন্য!"

—এই এক ভক্তপ্রসাদবাবু। কত পঞ্চী, ফতেমা, ইচ্ছে-রা ভক্তপ্রসাদের লোভের বলি হয়েছে তার সবটা লেখাজোখা নেই। আবার ছেলে অম্বিকা সম্পর্কে যখন ভক্তপ্রসাদ আনন্দর সঙ্গে কথা বলেন, তখন রক্ষণশীল পিতার মুখোশ পরে নিতে ভুল হয় না। আনন্দর কাছে ভক্তপ্রসাদের প্রথম প্রশ্ন, অম্বিকার পড়াশোনা কেমন হচ্ছে এবং দ্বিতীয় প্রশ্ন অম্বিকা কোন 'অধর্ম্মাচরণ' শিখছে কিনা। ভক্তপ্রসাদের অধর্মাচরণের সংজ্ঞা, ব্রাহ্মণের প্রতি অবহেলা, গঙ্গাস্নানের প্রতি ঘৃণা, এই সকল খ্রিষ্টিয়ানি মত-'। অন্যদিকে, জমিদার মশাই অত্যন্ত সচেতন যে অম্বিকা অধঃপাতে যাবে না কারণ—"সে আমার ছেলে কিনা"। কলকাতায় 'কায়স্থ, ব্রাহ্মণ, কৈবর্ত্ত, সোনারবেনে, কপালী, তাঁতী, জোলা, তেলী, কলু'—সব জাত বিচার উঠে গিয়ে পরস্পরের ছোঁয়া খায় শুনে আতঙ্কিত ভক্তপ্রসাদ। 'কলকেতায়' হিন্দুরা মুসলমান বাবুর্চি রাখে শুনে ঘেন্নায় 'থু! থু!' করে ওঠেন তিনি। অথচ ফতেমার যৌনব সম্পর্কে তাঁর কোন বাছবিচার থাকে না।

ভক্তপ্রসাদরা সমাজের বিপজ্জনক চরিত্র কেননা এরা স্বচ্ছন্দে মুখোশ পরে ঘুরতে পারে। নিজেরা অন্যায়

করছে জেনেও ধর্মের জয়জয়কার করতে এদের বিবেকে বাধে না।

২.৪ অন্যান্য চরিত্র

'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনে ভক্তপ্রসাদ ছাড়া গ্রামের অন্য সকলেই প্রায় দরিদ্র শ্রেণির মানুষ। যদিও পীতাম্বর তেলী ও তার পরিবারকে কিছুটা বর্ধিষ্ণু বলেই মনে হয়। গদাধর, বাচস্পতি, হানিফ, ফতেমা—এরা সবাই নিম্নবিত্ত।

গদাধর নিম্নবিত্ত কিন্তু সেও অধঃপতিত। ভক্তপ্রসাদের নারী-আসক্তির সুযোগ নিয়ে সে কিছু আদায় করে নেয় এবং উৎসাহিতও করে তার প্রভুকে। প্রহসনের একেবারে শুরুতে হানিফের সঙ্গে গদাধরের কথোপকথনের সময় আপাতদৃষ্টিতে গদাধরকে সহৃদয়, সংবেদনশীল একজন মানুষ বলে মনে হয়। নিজে সে দরিদ্র এবং আর একজন দরিদ্র মানুষের বিপদে তাকে সহমর্মী বলেই মনে হয়। হানিফকে জমাদারের কাছে জমা দিয়ে আসার প্রস্তাব দিলে হানিফ তাই তার হয়ে দুটো কথা বলার জন্য গদাধরকে অনুরোধ করে। এরপরই গদাধর নিজমূর্তি ধারণ করে। হানিফকে আশ্বস্ত করে সে ভক্তপ্রসাদের কাছে হানিফকে মাপ করে দেওয়ার অনুরোধ জানায় এই শর্তে : "ও বেটা এবার যে ছুঁড়ীকে নিকে করেছে তাকে কি আপনি দেখেছেন?" গদাধর শুধুই অধঃপতিত নয়, সে জানে কথার ভেলকিতে কেমন করে ভোলানো যায় ভক্তপ্রসাদকে। ভক্তপ্রসাদের মনে মুসলমান ফতেমা সম্পর্কে একটু দোটানার বাষ্প দেখেই ঝোড়ো হাওয়ায় উড়িয়ে দেয় তা গদাধর—"মশায়, মুসলমান হলো তো বয়ে গেল কি? আপনি না আমাকে কত বার বলেছেন যে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে গোয়ালাদের মেয়েদের নিয়ে কেলি কত্যেন।" ভক্তপ্রসাদ সকলের সামনে মালা জপেন, হরির নাম করেন আর অন্ধকারে মেয়েদের সর্বনাশ করেন। সেখানে গদাধরই তার প্রধান সহায়ক। গদাধর পাকা ব্যবসায়ীর মতই দরাদরি করে—"আজ্ঞে এর কম হবে না, ... হাজারো হোক ছুঁড়ী বউমানুষ কি না।"—অর্থাৎ শ্রেণিগত অবস্থানে হানিফদের সঙ্গো একই ধাপে থাকলেও গদাধর কিছুটা স্বতন্ত্র। মেয়ে ব্যবসায়ের দালাল। তাই তার স্বগত কথন—"কত্তাটি এমনি খেপে উঠলিই তো আমরা বাঁচি,—গো মড়কেই মুচির পার্ব্বণ।" গদাধর অন্যায় করেও বিন্দুমাত্র অনুতপ্ত হয় না বরং ফতেমার বর্ণনা দিতে গিয়ে সে খুব সহজেই তার তুলনা করে ইচ্ছে নামের আর একটা মেয়ের সঙ্গে। "আজ্ঞে, ঐ যে ভট্‌চাজ্যিদের মেয়ে। আপনি যাকে—(অর্দ্ধোক্তি) তার পরে যে বেরিয়ে গিয়ে কসবায় ছিল"। শুধু তাই নয়, তার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কেও পরম তাচ্ছিল্যের সঙ্গো সে বলে, "আজ্ঞে সে এখন বাজারে হয়ে পড়েছে। ..."

তাই প্রহসনের শেষ দৃশ্যে ভক্তপ্রসাদের প্রাপ্য লাঞ্ছনার একটু ভাগ (ভূতের ভয়) তাকেও পেতে হয়। গদাধর দরিদ্র, আবার কিছুটা অসৎও।

বাচস্পতি ব্রাহ্মণ কিন্তু সে দরিদ্র। ভক্তপ্রসাদ ব্রাহ্মণ-দেবতা ইত্যাদি সম্পর্কে শ্রদ্ধায় অবনত হন কথায় কথায়, আবার দরিদ্র বাচস্পতির সম্পত্তি কেড়ে নেন। বাচস্পতির মা মারা গেলে দরিদ্র ওই ব্রাহ্মণ সাহায্য প্রার্থী হয়ে এলে সে মাত্র পাঁচ টাকা পায়। বাচস্পতি ব্রাহ্মণ হলেও সে হানিফদের অত্যন্ত প্রিয়জন, কাছের মানুষ। সে

কারণেই হানিফ পরামর্শ করার জন্য বাচস্পতিকেই বেছে নেয়। বাচস্পতি বুদ্ধিমান। তার পরিকল্পনা অনুসারেই ভক্তপ্রসাদকে উচিত শিক্ষা দেওয়া গিয়েছিল।

হানিফ সৎ কৃষক। সে অশিক্ষিত, দরিদ্র কিন্তু তার ভাবনায়-কথায়-কাজে মিল। সে ছলনা বোঝে না। তার কথা স্পষ্ট।

২.৫ প্রহসন ঃ তুলনা এবং প্রতিতুলনা

মাইকেল মধুসূদন দত্ত ১৮৬০-এ এই দুটি প্রহসন লিখলেন। আসলে উনিশ শতক থেকেই বাংলা সাহিত্য প্রতিবাদের হাতিয়ার হতে শুরু করেছিল। মধুসূদন দত্তের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের একটা আত্মিক যোগাযোগ ছিল। সমাজ সংস্কার আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা মধুসূদনের মত নাট্যকারের পক্ষে অনুধাবন করা তাই স্বাভাবিক। ডিরোজিওর যুক্তিবাদী আন্দোলনের পরোক্ষ প্রভাবও নাট্যকারের ওপর পড়েছিল; অতএব তিনি দুটি প্রহসনে সমাজের দুটি জ্বলন্ত সমস্যাকে তুলে ধরেছেন।

'একেই কি বলে সভ্যতা?'য় নবকুমার, কালীনাথবাবু ইত্যাদি চরিত্রের মধ্য দিয়ে যুব সমাজের অধঃপতিত হওয়ার প্রবণতা এবং অসম্পূর্ণ ইংরেজি শেখা যুবকদের মধ্যপানে আসক্তি, সভা-সমিতির নামে বেলেল্লাপনা ইত্যাদি তুলে ধরেছেন। সভ্যতার সঠিক অর্থ না বুঝে নকল ইওরোপিয়ান মুখোশটাকেই আসল বলে ধরে নেওয়া যে দেশের সংস্কৃতিকে বিনষ্ট করে ফেলতে পারে এই প্রহসনের মধ্য দিয়ে তাই তুলে ধরেছেন নাট্যকার। হরর এই খোদাক্তিতে তাই প্রহসন শেষ হয় ঃ "বেহায়ারা আবার বলে কি, যে আমরা সায়েবদের মতন সভ্য হয়েচি। হা আমার পোড়া কপাল! মদ্ মাস খেয়ে ঢলাঢলি কল্লেই সভ্য হয়?—একেই কি বলে সভ্যতা?"

'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনে সমাজ সমস্যার অন্য একটা দিক তুলে ধরা হয়েছে। নষ্ট চরিত্রের সমাজপতিদের আসল রূপ তুলে ধরা হয়েছে এই প্রহসনে। তাদের মুখোশ টেনে খুলতে পারলেই যে সমাজকে দূষণমুক্ত করা সম্ভভব তার ইঙ্গিতও দিয়েছেন। ভক্তপ্রসাদের বিকৃত রুচিই তাই এই প্রহসনের শেষ কথা নয়, শেষ হয়েছে তার আক্কেল তৈরি হওয়ার মধ্যে ঃ

"আমি যেমন অশেষ দোষে দোষী ছিলেম, তেমনি তার সমুচিত প্রতিফলও পেয়েছি। এখন নারায়ণের কাছে এই প্রার্থনা করি যে এমন দুর্ম্মতি যেন আমার আর কখনও না ঘটে।"

পরবর্তী কালে দীনবন্ধু মিত্রের আর একটি সাড়াজাগানো প্রহসন 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'-তে এইরকমই একটি সমাজ-সমস্যা উঠে এসেছে। 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনের ভক্তপ্রসাদের মতই সেখানেও এক বিগতযৌবন বৃদ্ধ বারবার বিয়ে করতে চায়। বলাবাহুল্য সেখানেও তার লক্ষ্য বালিকা, কিশোরী, যুবতীরা। অবশেষে পাড়ার সচেতন যুবকরা বুড়োর বিয়ে করার প্রবণতা ঘুচিয়ে দেয়। একটা শুয়োরকে কনে সাজিয়ে উপস্থিত করে এবং এভাবেই তার চৈতন্যোদয় ঘটে।

তিনটি প্রহসনেই সমাজের সমস্যাকে চিহ্নিত করে তার সমাধানের ইঙ্গিতও দেওয়া হয়েছে। আসলে 'Art for art sake'—এই ধারণায় সাহিত্য রচনা যেমন হয়েছে, তেমনি উনিশ শতক থেকেই সমাজ সংস্কারের

জন্যও সাহিত্যকে ব্যবহার করা হয়েছে। এই সব প্রহসন সেই সব সাক্ষ্য বহন করে।

২.৬ বিস্তৃত প্রশ্ন

১। বাংলা সাহিত্যে 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনটির গুরুত্ব বিচার করুন।

২। 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনের ভাষা বৈশিষ্ট্য দৃষ্টান্ত সহযোগে আলোচনা করুন।

৩। 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ', 'একেই কি বলে সভ্যতা?' এবং দীনবন্ধু মিত্রের 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' প্রহসন তিনটির তুলনামূলক আলোচনা করুন।

৪। 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনের চরিত্র চিত্রণের সার্থকতা বিচার করুন।

২.৭ অবিস্তৃত প্রশ্ন

১। 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনের নারী চরিত্রগুলির বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

২। হানিফ চরিত্রটি আলোচনা করুন।

৩। প্রহসনের শেষ অঙ্কে শিবমন্দিরের দৃশ্য বর্ণনা করুন।

৪। আনন্দ, চরিত্রটি কতটা প্রাসঙ্গিক বলে আপনার মনে হয়?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনটির রচনাকাল কত?

২। ভক্তপ্রসাদের ছেলের নাম কী?

৩। 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনের নারী চরিত্রগুলির নাম লিখুন।

৪। এই প্রহসনের শেষে একটি নীতিশিক্ষা কাব্যের আকারে লেখা আছে। সেটা কি এবং কতটা প্রাসঙ্গিক।

২.৮ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। "ধনঞ্জয় অষ্টাদশ দিনে একাদশ অক্ষৌহিনী সেনা বধ করেন"—কে, কখন বলেছিল?

২। "কলিদেব এতদিনেই যথার্থরূপে ভারতভূমিতে অবতীর্ণ হলেন।"—কে, কখন বলেছিল?

৩। 'তজ্‌দি', 'ব্রহ্মত্র' কথা দুটির অর্থ কী?

৪। "চার ঘড়ীর" সময় কে, কাকে, কোথায় যেতে বলেছিল?